পূর্ব্ব স্মৃতি।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

শ্রীসাতকড়ি হালদার
কর্ত্তৃক প্রণীত।

এচ, সি, গাঙ্গুলী এণ্ড কোং দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২ নং ম্যাঙ্গো লেন।

স্বর্গীয়া শ্রীমতী প্রমোদিনী দাসী।

প্রিয়তমে,

গিয়াছ ত্যজিয়া মোরে—গিয়াছে কি স্মৃতি ?
হৃদয় মন্দিরে সদা জাগে প্রতিকৃতি।
যেথা থাক সুখে থাক—কামনা আমার,
আসিবে আসিবে দিন মিলিব আবার॥

তোমার হতভাগ্য স্বামী,

শ্রীসাতকড়ি হালদার।

আজি সেই ১৯শে ফাল্গুন—সেই ভয়ঙ্কর দিন—যে দিন আমার সৌভাগ্যশশী অস্তমিত হইয়াছে, যে দিন আমার গৃহলক্ষ্মী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, যে দিন হইতে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যে দিন হইতে ইহলোকের সর্ব্বসুখে আমি বঞ্চিত হইয়াছি।

পূর্ণ এক বৎসর গত হইল প্রমোদিনীর সহিত আর সাক্ষাৎ নাই। আবার কি সাক্ষাৎ হইবে? সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই তাহা জানেন। ইহা ক্ষুদ্র মানবের জ্ঞানাতীত। কিন্তু আশাই মানব জীবনের প্রধান অবলম্বন। আশা না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারিত না। এ নশ্বর দেহ থাকিতে দেখা না হইতে পারে কিন্তু দেহত্যাগে সাক্ষাৎ হইবে ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস। ভগবন্, এ বিশ্বাস যেন বিচলিত না হয়।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, বৎসর পূরিল, কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি যাবার নয়। সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই হাসি হাসি মুখখানি, সেই বিশাল নয়ন দুইটী, সেই সুন্দর গঠন চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই, স্বপ্নেও দেখিতে পাই, কিন্তু হায়! এ দর্শনে মন তৃপ্ত হয় না, মন যাহা চায় তাহা যেন পায় না। কত দিন কত স্বপ্ন দেখিলাম

স্বপ্নে কত কথা পরস্পর কহিলাম, পূর্ব্বমত হাসিলাম, পূর্ব্বমত একত্রে কত গল্প করিলাম, কত বিষয় ভাবিলাম কিন্তু, হায়, স্বপ্নও ভাঙ্গিল আর দেখা পাইলাম না।

আজ ক্রমে ক্রমে সকল কথা মনে পড়িতেছে। সেই ১৬ই অগ্রহায়ণ ১২৮৮ সাল। সেই ঝামাপুকুরের বাটী। সেই শুভরাত্রি। সেই প্রথম শুভদৃষ্টি। সেই বাসর ঘর, কতই আমোদ। চারিদিকে হুলুধ্বনী, মঙ্গলের চিহ্ন। মনের কতই উল্লাস! হায, সকলই স্বপ্ন! তখন কলেজের ছাত্র। নবানুরাগ মনে বড়ই প্রবল। কত উৎসাহ, কত আশা! ভাবিতাম যেন চিরকালই এ ভাব থাকিবে। ভাবিলাম পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে জীবন উৎসর্গ করিলাম ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ সুখকর হইবে। এ বিপদের কথা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। বিবাহের বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে, ছাত্রাবস্থা যাইতে না যাইতে অধ্যাপক পদ প্রাপ্ত হইলাম, পর বৎসরেই উকীল হইলাম, তাহার পর বৎসরই আবার আইন অধ্যাপক হইলাম। মনে আহ্লাদ আর ধরে না। কিন্তু এ আহ্লাদের যে সীমা আছে তখন তাহা জানিতাম না।

সাগর পারে চট্টগ্রামে ওকালতি করিতাম। প্রমোদিনীকে তথায় লইযা যাই। তাহা আজ ১০ বৎসরের কথা। তখন চট্টগ্রামে যাইতে হইলে সমুদ্র দিযা ষ্টীমার করিয়া যাইতে হইত। রাত্রিতে আমরা আরমিনিয়া ঘাটে ষ্টীমারে উঠিলাম ও আমাদিগের রিজার্ভ ক্যাবিন অধিকার করিলাম। ক্যাবিনের আযতন ছোট হইলেও ইহা সুসজ্জিত ছিল। সেই

রাত্রিতে নিদ্রা সম্ভব ছিল না। ষ্টীমারের ভিতরে একদিকে ষ্টীমের ধক্ ধক্ শব্দ, ওদিকে খালাসিদিগের গোলমাল, মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার যাত্রীদিগের কোলাহল, নিদ্রা হইবার যো ছিল না। উভয়ে ক্যাবিনের বাতায়নের নিকট বসিয়া নিস্তব্ধে ভাগিরথীর বক্ষ হইতে নিশীথকালীন কলিকাতার শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম। সম্মুখে উত্তর দক্ষিণ যতদূর দৃষ্টি চলে সুন্দর গ্যাসের আলো এক বক্র রেখায় অবস্থিত। নীচের দিকে গঙ্গার বক্ষে অসংখ্য জাহাজ ও ষ্টীমারের উজ্জ্বল দীপ-মালা। অপর দিকে হাবড়ার পোলের বিদ্যুতের ছটা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপরে সেই অনন্ত-কাল ব্যাপী নক্ষত্র মণ্ডলীর স্নিগ্ধকর কিরণ। সেই সুখময় রজনী তিমিরাবৃত হইয়াও আলোকময় বোধ হইতেছিল। চারিদিকে আলো। তখন মনেও আলো, বাহিরেও আলো। কিন্তু হায়, এখন সকলই অন্ধকারময়! যে মন অন্ধকারকে আলোক বলিয়া ভাবিত, আজি সেই মন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকই অন্ধকারময়। আজিও সেই নয়ন আছে বটে, কিন্তু সেই নয়ন-তারা নাই।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ষ্টীমারের নঙ্গর উঠিল। ধিক্ ধিক্ করিয়া ষ্টীমার বহুজনাকীর্ণ বিবিধ অর্ণবযান সজ্জিত সমৃদ্ধশালী কলিকাতার বন্দর অতিক্রম করিয়া চলিল। যতই সাগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, নদী ততই বিস্তৃত হইতে লাগিল। বৈকালে প্রায় ৫টার সময় ষ্টীমার সেই পুরাতন পুণ্যতীর্থ সাগর সঙ্গমে উপস্থিত হইল। হিন্দু রমণীর

ভাগ্যে সমুদ্র দেখা প্রায় ঘটে না। সম্মুখে বিশাল জল রাশি। কেবল আমাদের এক খানি ষ্টীমার। দূরে সুন্দর বনের বৃক্ষ-রাজির রেখা মাত্র দৃষ্টি গোচর হয়। তাহাও আবার কিয়ংক্ষণ পরে অদৃশ্য হইল। তখন কেবলই জল, চারি দিকেই জল, স্থলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। সেই ঘন কৃষ্ণ বর্ণ অগাধ জল রাশির গম্ভীর দৃশ্য এক দিকে অতি ভয়ঙ্কর, অপর দিকে আবার তেমনিই মনোহর। সেই দৃশ্যে ঘোর নাস্তিকের মনও ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। অপর দিকে নির্ভীকের মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। সেই সমুদ্র দেখিয়া প্রমোদিনীর মুখ শুকাইয়া গেল। একে সমস্ত দিনের মধ্যে ফল মূল ভিন্ন আহার হয় নাই, তাহার উপর সেই সমুদ্রের ভীষণ মূর্ত্তি হিন্দু কূলবধূর পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ রাত্রি সমাগত। সেই অন্ধকার রাত্রিতে সমুদ্র মাঝে প্রমোদিনীর নিদ্রা নাই। সর্ব্বদা ভয়ে সশঙ্কিত। ভয় নাই বলিয়া কতই বুঝাইতে লাগিলাম, কত গল্পচ্ছলে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম কিন্তু স্পষ্টই বোধ হইতে লাগিল প্রমোদিনীর মন কিছুতেই সুস্থির হইল না। মধ্যে মধ্যে "এ ওকালতি অপেক্ষা কেরাণিগিরি ভাল" বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া পরিহাস করিত। প্রমোদিনী, এখন তুমি কোথায়? আর একবার তোমার সেই মিষ্ট পরিহাস শুনিতে ইচ্ছা হয়। অনেক দিন যে তোমার সেই মিষ্ট কথা শুনি নাই।

রাত্রি প্রভাত হইল। তখনও সমুদ্রের জল সেই ঘোর

কৃষ্ণবর্ণ। সম্মুখে অরুণোদয়। আহা! কি অপূর্ব্ব দৃশ্য। যিনি সমুদ্র মাঝে সূর্য্যের উদয় কি অস্ত একবার দেখিয়াছেন তিনি তাহা আর কখন তাঁহার জীবনে বিস্মৃত হইবেন না। পূর্ব্ব দিক লাল বর্ণে পরিপূর্ণ, যেন সমুদ্রের অপর প্রান্তে কোন দেশে বিশাল অগ্নিদাহ হইতেছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই সাগর গর্ভ হইতে যেন একটী প্রকাণ্ড কাঞ্চন নির্ম্মিত গোলক ক্রমে ক্রমে জল রাশি ভেদ করিয়া গগণে উত্থিত হইতেছে। নিমিষ মধ্যেই পূর্ণ বিকাশ। সেই মনোহর দৃশ্যে পূর্ব্ব রাত্রির দুর্ভাবনা সকল দুই জনে কিয়ৎক্ষণের জন্য সমুদয় ভুলিয়া গেলাম। মনে হইয়াছিল যেন এই এক দৃশ্য দ্বারা সকল কষ্ট সার্থক হইল।

ষ্টীমার ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। জলের রঙ ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গিয়া নীলবর্ণ দেখা যাইতে লাগিল এবং সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নীল বর্ণের বদলে সাধারণ ঘোলা জল দেখা গেল। তখন দুই একটী বৃক্ষের গোড়া, দুই একটী পূতিগন্ধপূর্ণ মৃত পশুর দেহ জলে ভাসিতে ভাসিতে সাগরাভিমুখে যাইতেছে। দুই একটী পক্ষীও উড়িতে উড়িতে ষ্টীমারের মাস্তলের উপর আসিয়া বসিতে লাগিল। কখনও বা স্থানে স্থানে ঝাঁকে ঝাঁকে শ্বেতবর্ণ হংস সদৃশ সমুদ্র পক্ষী সকল জলের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া যেন পরস্পর খেলা করিতেছে দেখা গেল। যদিও ঐ সকল চিহ্ন দ্বারা স্থল অনতিদূরে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল কিন্তু তখনও কোন স্থল দেখা যায় নাই।

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পরেই দূরে কুতবদিয়ার বাতি ঘরের আলো দৃষ্টিগোচরে পতিত হইল। তখন ষ্টীমারের মধ্যে আহ্লাদের আর সীমা নাই। সকলেরই মন আহ্লাদে উল্লাসিত যেন তাহাদের একটী দুর্ভাবনা মন হইতে অপসারিত হইল। আমাদিগেরও ঠিক সেই ভাব মনে হইয়াছিল। বাতি ঘরের আলোক দৃষ্টিগোচর হইবার অল্পক্ষণ পরেই কর্ণফুলি নদীর মুখে ষ্টীমার নঙ্গর করিল। রাত্রিতে নদীর ভিতর ষ্টীমার চলিতে নিষেধ। সুতরাং সেই রাত্রিও সমুদ্র বক্ষে যাপন করিলাম।

পরদিন সকালে ষ্টীমার আবার চলিতে লাগিল। উভয় পার্শ্বে চট্টগ্রামের বৃক্ষলতা মণ্ডিত সুন্দর পাহাড়-শ্রেণী দূরে দৃষ্টিগোচর হইল। ষ্টীমার ক্রমে ক্রমে নদীর ভিতর প্রবেশ করিল। আমরাও নদীর পার্শ্বে লোকজন পরিপূর্ণ পল্লিগ্রাম সকলের শোভা দর্শন করিতে করিতে চলিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যেই ষ্টীমার চট্টগ্রামের সদর ঘাটের জেটীর নিকট থামিল। জেটীর পার্শ্বে পূর্ব্ব আদেশ মত গাড়ি প্রস্তুত ছিল। আমরা ষ্টীমার হইতে নামিয়া গাড়িতে প্রবেশ করিলাম এবং শীঘ্রই আমাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে উপনীত হইলাম।

চট্টগ্রামে প্রমোদিনীর সহিত আমি ৩।৪ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি। চট্টগ্রামের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অতি রমণীয়। সম্মুখে সমুদ্র, পশ্চাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়-শ্রেণী উত্তর দক্ষিণ বরাবর চলিয়া গিয়াছে। সহরের মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। ইহার জলবায়ু অনেকে অস্বাস্থ্যকর বলিয়া থাকেন

কিন্তু আমরা যত দিন সেখানে ছিলাম কি সদরে কি মফঃস্বলে এক দিনের জন্যও কোন প্রকার অসুখ বোধ করি নাই। বরং নিজ চট্টগ্রাম সহরের ঝরণার জল যাহা সাধারণ সকলে পান করে তাহা কলিকাতার কলের জল অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। চট্টগ্রাম, তোমার অধিবাসীগণ অনেক দোষে কলুষিত হইলেও, তোমার জলবায়ু সম্বন্ধে অনেক মতভেদ থাকিলেও, তুমি আমার চিরস্মরণীয়। তোমার নামে কলিকাতা অঞ্চলের অনেকের হৃদকম্প উপস্থিত হয় বটে কিন্তু আমার হৃদয়ে ঠিক বিপরীত ভাবের সঞ্চার হয়। চট্টগ্রাম আমার প্রথম কর্ম্মক্ষেত্র। এই স্থানে আমার জীবনের কয়েকটী অতি সুখময় বৎসর অতিবাহিত করি। প্রমোদিনী। তুমি কি সব ভুলিয়া গিয়াছ? দুই জনে কত দিন পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইয়াছি এবং বেড়াইতে বেড়াইতে প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে কতবার বিমুগ্ধ হইয়াছি। কতবার ক্লান্ত হইয়া সুস্নিগ্ধকর নির্জ্জন বৃক্ষ ছায়ায় উভয়ে উপবেশন করিয়া শ্রম দূর করিয়াছি। সীতাকুণ্ড তীর্থ দর্শনে যখন দুই জনে যাই তখনকার কথা কি এখন মনে পড়ে? গহন কানন মধ্যে পবিত্র ব্যাস-কুণ্ডে যখন উভয়ে অবগাহন ও তর্পণ করি, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ ঘন জঙ্গল মধ্য দিয়া সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে যখন উঠি, পাহাড়ের উপরে মন্দির মধ্যে দুই জনে একত্রে যখন মহাদেব সম্ভুনাথ পূজা করি, ভূগর্ভ নিঃসৃত "জ্যোতির্ম্ময়" অগ্নিশিখা যখন প্রদক্ষিণ করি তখন মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা কি এখন মনে পড়ে? পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে

কতবার পদস্খলন হইয়া উভয়ে পড়িয়া গিয়াছি, কতবার লতা কণ্টক দ্বারা উভয়ের গাত্র ক্ষত হইয়াছিল কিন্তু তখন মনের আনন্দে কিছুই কষ্টকর বোধ হয় নাই। পূজা সমাপন্তে 'মন্দাকিনীর' স্বচ্ছ বরফ সদৃশ সুশীতল জলধারা অঞ্জলি দ্বারা পান করা কি মনে পড়ে? সেইরূপ তৃপ্তিকর জলপান জীবনে বোধ হয় আর কখন ঘটে নাই।

কার্য্যোপলক্ষে তোমার নিকট হইতে কোন সময় অন্তরে থাকিতে হইলে তুমি যে আমার নিমিত্ত কত উদ্বিগ্না হইতে এখনও কি সেরূপ উদ্বিগ্না হও? বিদেশ হইতে তোমার নিকট আসিবার সময় যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতাম না। কত নদ নদী ঘোরতর ঝড়ের মধ্যে পার হইয়াছি, কত হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ বন জঙ্গল মধ্য দিয়া রাত্রিতে চলিয়া আসিয়াছি, কত কষ্ট করিয়া অনাহারে পার্ব্বতীয় পথ সকল পদব্রজে অতিক্রম করিয়াছি। এক ঘণ্টার জন্যও ঝড়ের অবসান অপেক্ষা করি নাই, দিনমানের অপেক্ষায় পথি মধ্যে রাত্রিতে বিশ্রাম করি নাই, গাড়ি পাল্‌কীর জন্য এক মুহূর্ত্তও কখন বিলম্ব করি নাই। তাহার পুরস্কার কি এই অনন্ত বিচ্ছেদ?

১২৯৭ সালে পূজার সময় আমরা শেষবার চট্টগ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসি। এবারে সমুদ্র দিয়া না আসিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালা অঞ্চল দেখিবার উদ্দেশে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ঢাকা জেলা সকল বেড়িয়া নারানগঞ্জে উপস্থিত হই এবং তথা হইতে ষ্টীমার করিয়া গোয়ালন্দে আসি। পরে রেল দ্বারা

কলিকাতায় উপনীত হই। পথি মধ্যে কত নদ নদী পার হইতে হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রায় সমুদয় নদীই বেড়াইতে হইয়াছে। তন্মধ্যে ফেনী, ডাকাতে নদী, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা প্রধান। নৌকা যোগে আসিতে আসিতে দুই একটী বিপদের মুখেও পতিত হইয়াছিলাম। মেঘনার উপরে ঝড়ের মুখে যখন নৌকা পড়িয়াছিল তখনকার কথা মনে হইলে এখনও আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়। কিন্তু প্রমোদিনী, সেবার তোমারই জন্য রক্ষা পাইয়াছি। তোমার সেই কাতরোক্তি-পূর্ণ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এখনও হৃদয়ে গাঁথা আছে। শুদ্ধ এবার নহে কত বার কত রকম বিপদে পড়িয়াছিলাম কিন্তু তোমারই পুণ্যফলে, তোমারই সদ্বুদ্ধি ও পরামর্শে সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তাশীল দেখিলে তুমি যে অধীরা হইয়া পড়িতে। আমার চিন্তার কারণ জানিবার জন্য তুমি যে কত উৎসুকা হইতে। আমি কখন মনের ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিলে তুমি যে কত অভিমান করিতে ও কত কৌশলে তাহা জানিবার চেষ্ট করিতে। কিন্তু এক্ষণে কোন্ প্রাণে আমাকে এ অকূল বিপদ সাগরে ফেলিয়া চলিয়া গেলে? এই কি তোমার ভালবাসার পরিচয়?

চট্টগ্রাম হইতে আসিয়া প্রমোদিনী তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কয়েক মাসের জন্য আবার গমন করে। তাহার পিতা বাবু রাখাল চন্দ্র বসু তখন আরার সবজজ ছিলেন। তিনি প্রমোদিনীকে অতি ভাল বাসিতেন।

পিতার ন্যায় প্রমোদিনী স্বভাবতঃ উদারমনা ও তেজস্বিনী ছিল, এবং সেই তেজস্বিনতার সহিত অমায়িকতা মিশ্রিত থাকায় তাহাকে সকলে ভাল বাসিত। প্রমোদিনী, তোমার সেই তেজস্বী পিতাই বা এখন কোথায়, তুমিই বা এখন কোথায়? তুমি কি তোমার পিতার কোলে আশ্রয় লইয়া এ হতভাগ্যকে একবারে ভুলিয়া গেলে? হায়, সকলই স্বপ্ন।

১২৯৮ সালের পূজার পর আরা হইতে প্রমোদিনীকে লইয়া প্রথম আমি কাঁথি যাই। কাঁথিতে আমরা ৪ বৎসর কাল থাকি। প্রতি বৎসর পূজার ছুটীতে কলিকাতায় আসিতাম। কাঁথির জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। ইহা সমুদ্র হইতে কেবল মাত্র ৫ মাইল তফাৎ। এই হেতু এখানে গ্রীষ্ম ও শীত কালে বাঙ্গালার অনেক স্থান অপেক্ষা কম গ্রীষ্ম ও কম শীত বোধ হয়। আমরা মধ্যে মধ্যে কাঁথি হইতে সমুদ্র-স্নানে যাইতাম। চট্টগ্রামে থাকা উপলক্ষে আমরা অনেকবার সমুদ্র দেখিয়াছিলাম বটে কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সমুদ্রে নামিয়া স্নান করা কখন ঘটে নাই। সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অবগাহন করা যেমন এক দিকে অতি স্বাস্থ্যকর অপর দিকে ইহা তেমনি আমোদ ও প্রীতি-জনক। কতবার পরস্পরের হাত ধরিয়া দুই জনে সমুদ্রের ঢেউ খাইয়াছি। কতবার ইহার বিশাল তরঙ্গ মধ্যে খেলিতে খেলিতে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়াছি। সেই সকল কথা মনে পড়িলে এখন বুক ফাটিয়া যায়। মন যেন পাগল হয়। কতদিন সেই বিস্তীর্ণ নির্জ্জন সৈকতময় সমুদ্র-তীরে দুই জনে বেড়িয়া বেড়াইয়াছি। কতদিন ঐ সমুদ্র-

তীরস্থ কেযাফুল বৃক্ষের ছাযায বালুকা-স্তূপে দুই জনে নীরবে বসিযা সম্মুখে অনন্ত সমুদ্রের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে বিমোহিত হইযাছি। এ জীবন ফুরাইবার পূর্ব্বে আর একবার সেই রকমে দুই জনে সেই স্থানে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয। কিন্তু হায! এই ইচ্ছা এখন পূর্ণ হইবার যো নাই। মনের ইচ্ছা মনেই রহিল।

কাঁথিতে থাকিতে থাকিতে আমি মুন্সফি চাকরিতে বাহাল হই। সেই সমযে অল্পকালের জন্য প্রমোদিনী কলিকাতায ছিল এবং প্রমোদিনীর পত্রেই আমি প্রথম এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হই।

কাঁথিতে থাকিতে থাকিতে আমাকে দুইবার ঘাটালে অল্পকালের জন্য যাইতে হয। দুই বারেই প্রমোদিনী আমার সঙ্গে ঘাটালে গিযাছিল। প্রথম বারে ঘাটালে আমরা আমাদিগের আড়াই মাস বযস্ক একটী পুত্র সন্তান হারাইযাছিলাম। ১২৯৯ সালের ১লা আষাঢ তারিখে এই দুর্ঘটনা হয। ইহা প্রমোদিনীর জীবনের প্রথম শোক।

ঘাটালে শীলাবতী নদীর উপরে গবর্ণমেণ্টের একটী বাঙ্গালা ভাড়া করিযা আমরা তথায ছিলাম। ২য বার যখন আমরা ঘাটালে থাকি সেই বৎসর আষাঢ মাসে একটী প্রবল বন্যায ঘাটালের অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হয ও জলের প্রবল স্রোতে অনেক মাটী ঘর ভাঙ্গিযা যায ও দুই একটী লোকও মারা গিযাছিল। যে পারে এই সকল ঘটনা হইযাছিল সৌভাগ্য ক্রমে তাহার অপর পারে আমাদের বাসা

ছিল। তত্রাচ পাছে এদিকও ঐরূপ ভাঙ্গিয়া যায় সেই জন্য দুই রাত্রি ভয়ে আমাদের কাহারও ঘুম হয় নাই। এ পার ভাঙ্গিলে ছেলেদের কিরূপে রক্ষা করিবে, সেই চিন্তায় প্রমোদিনী দুই দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিল। প্রমোদিনী, যে সন্তানদিগের জন্য তুমি সর্ব্বদা এত উৎকণ্ঠা ও চিন্তাশীলা ছিলে, যাহাদিগকে এক মুহূর্ত্ত দেখিতে না পাইলে তুমি ব্যস্ত হইতে, যাহাদের সুখ-শান্তির জন্য তুমি নিজের সুখ জলাঞ্জলি দিয়াছিলে সেই আদরের ধন মুকলকে তুমি কিরূপে একেবারে ভুলিয়া গেলে? কোন প্রাণে তুমি এত অল্প দিনের মধ্যে সংসারের মায়া-রজ্জু ছিঁড়িলে?

১৩০০ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখে আমরা শেষবার ঘাটাল হইতে চলিয়া আসি। এবারে ঘাটাল হইতে কাঁথিতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে পূজার ছুটী সন্নিকট বলিয়া প্রমোদিনীকে কলিকাতায় রাখিয়া কেবল আশাতরু ও মায়াতরুকে লইয়া কাঁথিতে যাই। পূজার পরে প্রমোদিনীকে লইয়া পুনবার কাঁথিতে গমন করি। কাঁথিতে আমার একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। কৃপাতরু! তুমি যে আমাদের স্নেহের পুত্তলি ছিলে। আড়াই বৎসর কত কষ্টে কত যত্নে তোমার জননী তোমাকে পালন করিল কিন্তু তুমি আড়াই বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই পলাইয়া গেলে। তোমার শোকে যে তোমার জননী ধূলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়াছিল তাহা তুমি দেখিয়াছিলে? তোমার শোকে তাহার স্বাস্থ্য যে ভগ্ন হইয়াছিল তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছিলে? তোমারই শোকে ৩।৪ মাসের

মধ্যে তোমার জননী মানবলীলা সম্বরণ করিল। তুমি এক্ষণে তোমার সেই স্নেহময়ী জননীর কোলে পুনর্বায় আশ্রয় পাইয়াছ। তুমি ও তোমার জননী উভয়েই শান্তি লাভ করিয়াছ ইহা কল্পনা করিলেও আমি সুখী হই। কিন্তু তোমরা কি এখন এক মুহূর্তের জন্যও এই হতভাগ্যকে স্মরণ কর? কৃপাতরু, তুমি যেন তোমার জননীর আদর বেশী পাইয়াছিলে ও তা[illegible] পাইয়া আমাকে ভুলিয়াছ। কিন্তু প্রমোদিনী, তুমি কি করিয়া এই ১৪ বৎসরের ভালবাসা, মমতা একেবারে ভুলিয়া গেলে?

কাঁথি হইতে ১৩০১ সালের পূজার সময় দীনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঠাকুরগাঁয় আমি বদলি হই। ঠাকুরগাঁ বহুদূরে ও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম ও সেখানে উপযুক্ত বাসস্থান পাওয়া যায় না বলিয়া পূর্ব্বে সম্বাদ পাইয়াছিলাম। সেই কারণ প্রমোদিনীকে লইয়া সেই স্থানে যাইতে প্রথমে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় থাকিতে প্রমোদিনী অনেক বিষয়ে কষ্ট বোধ করিত এবং সেই জন্য কলিকাতায় থাকিতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাহাকে লইয়া ঠাকুরগাঁয় রহনা হই। দার্জিলিং মেলে আরোহণ করিয়া যথা সময়ে দামুকদিয়া ঘাটে রেলওয়ে ষ্টীমারে পদ্মা পার হই। সারাঘাটে আমরা পুনরায় রেলে চড়ি। পরে পার্ব্বতীপুরে অবতরণ করিয়া দী[illegible]র যাইবার নিমিত্ত উত্তর বাঙ্গালা ও বেহারের রেলে উঠি এবং তৎপর দিন [illegible]লা প্রায় ৭টার সময় আমরা দীনাজপুরে পৌঁছি। দীনাজপুরে কয়েক ঘণ্টার জন্য

আমার একটী বন্ধু ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের বাসায় আমরা বিশ্রাম করি এবং সেই দিবস বৈকালেই ঠাকুরগাঁয় যাত্রা করি।

দীনাজপুর হইতে ঠাকুরগাঁ ৩৫ মাইল দূর। গরুর গাড়ি করিয়া যাইতে হয়। রাস্তা অতি দুর্গম্য। রাস্তার অধিকাংশ স্থানই নিবিড় জঙ্গল। তন্মধ্যে ক্রমান্বয় ১২ মাইল বিস্তৃত প্রাণনগরের জঙ্গল অতি আশঙ্কার স্থল। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে দিনের বেলায় এই স্থানে ব্যাঘ্র আসিয়া মানুষ গরু নিয়তই মারিত। এখন যদিও ব্যাঘ্রাদির উপদ্রব কমিয়াছে, তত্রাচ লোকে ঐ স্থান দিয়া যাইতে ভয় করে।

পর দিবস প্রত্যূষে আমরা ঠাকুরগাঁয় পৌঁছি। দীনাজপুর হইতে ঠাকুরগাঁয় যাইতে 'উত্তর গো-গৃহ' বলিয়া একটী স্থান আছে। লোকে বলিয়া থাকে ইহা মহাভারতের সেই 'উত্তর গো-গৃহ'। স্থানের অবস্থা দেখিলে অবিশ্বাস করা যায় না। আমরা যতদূর দেখিয়াছি প্রায় ১ মাইল বিস্তৃত একটী উচ্চ মাটীর প্রাচীর মতন দেখা যায় এবং উক্ত প্রাচীরের নীচে একটী নদী ও স্থানটীর আকার গোল। প্রবাদ আছে, ঐ স্থানে গরু সকল থাকিত এবং ঐ নিকটবর্ত্তী নদীতে ঐ সকল গরু জলপান করিত। উহার নিকটবর্ত্তী জঙ্গলের মধ্যে এখনও নাকি ২।৪টী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হওয়া যায়।

ঠাকুরগাঁ একটী জঙ্গলময় স্থান, ইহার নীচে টাঙ্গন নদী প্রবাহিত। শীত ও গ্রীষ্মকালে ইহাতে জল থাকে না কিন্তু বর্ষাকালে ইহা জলে পরিপূর্ণ হয় ও জলের স্রোত অতি খরতর হয়। ঠাকুরগাঁর চারিদিকেই জঙ্গল। নদীর অপর পারে

গোবিন্দনগরের জঙ্গল এবং ঐ জঙ্গল মধ্যে দীনাজপুরের মহারাজার গোবিন্দজীর মন্দির আছে। ঠাকুরগাঁয় থাকিতে আমরা সকলে এক দিন সন্ধ্যার সময় গোবিন্দজীর আরতি দর্শন করিতে যাই। গোবিন্দজীর মন্দিরের অবস্থা অতি শোচনীয়। প্রায় সমুদয় গৃহাদি ভগ্নাবস্থায় আছে ও মন্দিরের প্রাঙ্গন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রবাদ আছে যে, এই বিগ্রহ বাণ রাজার পুরোহিতের প্রতিষ্ঠিত।

আরতি দর্শনান্তে জোৎস্নালোকে নদীর ধারে আমরা অল্পক্ষণ বেড়াইয়াছিলাম। কিন্তু নদীর সন্নিকটে জঙ্গল থাকায় ব্যাঘ্রাদির ভয়ে বেশীক্ষণ থাকিতে সাহস হয় নাই। শীঘ্রই বাসায় প্রত্যাগমন করি।

ঠাকুরগাঁর স্বাভাবিক দৃশ্য চট্টগ্রাম কি কাঁথির ন্যায় চিত্তরঞ্জক নহে। কিন্তু ইহা দেখিলে মনে এক প্রকার গম্ভীর ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। সম্মুখে দূরবর্ত্তী হিমালয়ের অত্যুচ্চ চির-বরফ-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ সকলের ধবলাকৃতি দৃষ্টি করিলে মনুষ্য যে ঈশ্বরের রাজ্যে অতি সামান্য বস্তু তাহা একেবারেই প্রতীয়মান হয়। অপর দিকে নিকটস্থ জনশূন্য জঙ্গল সকল ও তন্মধ্যস্থিত মনুষ্যের ভগ্নাবশিষ্ট বাসস্থান, বাগান, পুষ্করিণী প্রভৃতি দেখিলে মনুষ্য জীবন যে ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী তাহাও বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

এ অঞ্চলে অনেক স্থান মহাভারতের ঘটনার স্থল বলিয়া জনপ্রবাদ থাকায় ইহা অতি প্রাচীন দেশ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। সকল প্রাচীন বস্তুই বিলুপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই স্বভাবের

নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এ অঞ্চলের পূর্ব্ব গৌরব ও কীর্ত্তি সমূহ বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল চিহ্ন মাত্র দৃষ্টি গোচর হয়। প্রাচীন বস্তুই বিলুপ্ত হয়, ইহা কি বাস্তবিক স্বভাবিক নিয়ম? সন্ধ্যা না হইলে সূর্য্য অস্ত যায় না, ফল না পাকিলে বৃক্ষ হইতে পড়ে না, ফুল প্রস্ফুটিত না হইলে ঝরে না। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। প্রমোদিনী তুমি তবে প্রাচীন হইবার বহু পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইলে কেন? মধ্যাহ্ন জীবনে আসিবার অগ্রেই অন্ধকারে মিশিলে কেন? অর্দ্ধ পক্ক না হইতেই বৃক্ষচ্যুত হইলে কেন? অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত হইতে না হইতেই ঝরিলে কেন? তবে বুঝিলাম অদৃষ্টের চক্রে স্বভাবের নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটে। প্রাতঃ সূর্য্যও রাহুগ্রাসে পতিত হয়, শরৎশশীও মেঘাবৃত হয়, অপক্ক ফলও ঝড়ে বৃক্ষচ্যুত হয়, নব প্রস্ফুটিত মুকুলও অতি রৌদ্রে ঝরিয়া যায়। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন।

ঠাকুরগাঁয় প্রমোদিনী কেবল মাত্র ৮৯ মাস থাকে। সেখানে তাহার ও ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় ১৮৯৫ সালের আগষ্ট মাসে ঐ স্থান হইতে বদলি হইবার চেষ্টা করিবার জন্য ১ মাসের ছুটী লই এবং ঐ সনের পূজার ছুটীর সময় আমি বনগাঁয় বদলি হই।

ঠাকুরগাঁ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। ঠাকুরগাঁ হইতে অপরাহ্ণ আন্দাজ ৪টার সময় আমরা রহনা হই। সেই সময় বর্ষাকাল, ঠাকুরগাঁর সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে ভয়ানক

বৃষ্টি আরম্ভ হয় ও তাহা সমস্ত রাত্রি ও তৎপরদিবস বৈকাল পর্য্যন্ত ছিল। আমরা সকলেই ভিজিয়া গিয়াছিলাম, বিশেষতঃ তিস্তা নদী পার হইবার সময় নৌকায় কোন অচ্ছাদন না থাকায় প্রায় ১ ঘণ্টা কাল সকলকেই বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছিল।

পূজার ছুটীর পরেই আমরা বনগাঁয় যাই। বনগাঁয় কেবল মাত্র আমরা ২ মাস কাল অবস্থিতি করি এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই তথায় আমরা আমাদের কনিষ্ঠ পুত্র কৃপাতরুকে হারাই। কৃপাতরুর মৃত্যুর অল্পদিন বাদেই যশোহরে আমি বদলি হই। যশোহরেও আমরা কেবলমাত্র ২ মাস ছিলাম। যশোহরের জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এখানে এই দুই মাসের মধ্যেই আমাদের পরিবারস্থ প্রায় প্রত্যেকেই জ্বরে ভুগিয়াছিল। এই স্থানে থাকিবার কালে প্রমোদিনী তাহার পিতার মৃত্যু সম্বাদ প্রাপ্ত হয়। তিনি তখন ভাগলপুরের সবজজ ছিলেন। হটাৎ হৃদপিণ্ডরোগে ২৪ ঘণ্টা কালের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু সম্বাদ পাইয়া প্রমোদিনী নিতান্ত শোককাতরা হইয়া পড়িল। একে পুত্র শোকে বিহ্বলা তৎপরেই পিতার বিয়োগ সম্বাদ প্রাপ্তে হওয়ায় প্রমোদিনীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই আমাকে বাগেরহাটে যাইতে হইবে সম্বাদ পাই। বাগের-হাট যশোর অপেক্ষাও অস্বাস্থ্যকর এবং সেখানে উপযুক্ত গৃহাদি পাওয়া যায় না। পাছে প্রমোদিনীর এবং ছেলেদের কষ্ট হয় সেই ভয়ে তাহাদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া আমি

একা বাগেরহাটে যাইব স্থির করি। প্রমোদিনীর কলিকাতায় আসিতে কোন মতে ইচ্ছা ছিল না, যেন ভাবিয়াছিল কলিকাতায় গেলে কি বিপদ ঘটিবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও বাগেরহাটে উপযুক্ত বাসাবাটী না পাওয়া যাওয়ায় অগত্যা আমি তাহাদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া যাইতে বাধ্য হই।

কলিকাতায় আসিয়া ২৩ দিন বাদে প্রমোদিনীর অল্প জ্বর ও সর্দ্দি কাশি হইল। হায়! এই জ্বর ও কাশি আর সারিল না। যশোহর হইতে বাগের হাটে যাইবার আগে আমি প্রমোদিনীর সহিত কলিকাতায় ৫।৬ দিবস বিশ্রাম করি। আমার যাইবার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে ঐ জ্বর ও কাশি হয়। কিন্তু তখন কোন আশঙ্কার চিহ্ন দেখি নাই। প্রমোদিনীকে জ্বরের অবস্থায় রাখিয়া আমাকে যাইতে হইবে এই জন্য আমার অত্যন্ত চিন্তা হইয়াছিল কিন্তু প্রমোদিনী তাহার স্বাভাবিক কোমলতার সহিত আমাকে প্রবোধ বাক্য দ্বারা কত বুঝাইয়াছিল। "চাকরি যখন করিবে তখন কি করিবে অবশ্য যাইতে হইবে, আমার জ্বর শীঘ্র সারিবে, আমি খুব সাবধানে থাকিব, তুমি আমার জন্য ভাবিও না," এইরূপ কত কথা বলিয়া মন হইতে ভাবনা দূর করিতে প্রমোদিনী কত চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই জ্বর গায়েই আমার পথের উপযোগী খাবার ও জিনিসাদি আয়োজন করিয়া দিয়াছিল। সেই রাত্রির কথা মনে পড়িলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

বাগেরহাটে যথা সময়ে আমি উপস্থিত হইবার ১ দিন

পরেই প্রমোদিনীর শেষ হস্তলিপি পত্র আমি পাই। সেই পত্র পাইয়া আমার মন কিছু সুস্থির হইয়াছিল কারণ সেই পত্রে জ্বর ভাল হইয়াছে সম্বাদ পাইলাম, কিন্তু লেখা ছিল যে বুকে পাঁজরে অত্যন্ত বেদনা। মনে করিয়াছিলাম ঐ বেদনা শীঘ্রই সারিয়া যাইবে, কিন্তু ঐ বেদনা যে তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারি নাই।

বাগেরহাটে আমি কেবল মাত্র ৪ দিবস কার্য্য করি। ২৭শে ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার বেলা আন্দাজ ১টার সময়, বাগেরহাট হইতে আমি দোলের ছুটী উপলক্ষে কলিকাতায় আসিবার জন্য রহনা হই। সেই দিবসেই কলিকাতা হইতে প্রমোদিনীর পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়া বাগেরহাটে আমার নিকট টেলিগ্রাম পাঠান হয়, কিন্তু টেলিগ্রাম পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি রহনা হইয়াছিলাম, একারণ টেলিগ্রাম কলিকাতায় ফেরত আইসে। টেলিগ্রাম ফেরত আসিলে, আমি কলিকাতায় আসিতেছি তাহা প্রমোদিনী বুঝিতে পারিয়াছিল এবং সেই হেতু আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার জন্য তাহার যে উদ্বেগ হইয়াছিল তাহা অনেক অংশে উপশমিত হয়।

প্রমোদিনীর ব্যায়রাম এত বাড়িয়াছিল তাহা আমি কিছু মাত্রই জানিতে পারি নাই। তাহার ব্যায়রাম সারিয়াছে ইহাই আমার বিশ্বাস ছিল। প্রমোদিনীকে অসুস্থ দেখিয়া গিয়াছি, এখন গিয়া সুস্থ দেখিব এই আশায় আমি আসিতেছিলাম। শুক্রবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কলিকাতার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হই। কিন্তু বাটীর দরজায় গাড়ি হইতে

ন্যামিতেই দেখি দরজার উপর শ্রীমান জ্যোতিষ চন্দ্র কোথাও যাইবার বেশে দণ্ডায়মান। তাহাকে এত প্রত্যুষে ঐ বেশে কেন জিজ্ঞাসা করায় বলিল 'সেজ কাকীর জন্য দয়াল বাবু ডাক্তারকে ডাকিতে যাইতেছি'। এই কথা শুনিবা মাত্র আমার সকল আশা বৃথা হইল, মুখ শুকাইয়া গেল। দরজার ভিতর প্রবেশ হইবা মাত্রেই দাদা বলিলেন 'তোমার wifeএর heart-fail করিতেছে দয়াল বাবু বলিয়া গিয়াছে রাত্রি প্রভাত হইবার আগে আর বাঁচিবে না, তুমি এখন উপরে যাইও না তোমাকে দেখিয়া তাহার ব্যায়রাম বৃদ্ধি হইতে পারে'। শুনিবা মাত্র সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। দাদার কথা না শুনিয়াই রাস্তার বেশ ছাড়িয়া দৌড়া দৌড়ি করিয়া উপরে গিয়া দেখি পালঙ্গোপরি প্রমোদিনী শুইয়া আঃ। উঃ। করিতেছে, দিদিমণি বাতাস করিতেছে, বড় বৌ ও পদ্ম পালঙ্গের উপর বসিয়া শুশ্রুষা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে 'একটু জল দাও, একটু জল দাও' বলিয়া প্রমোদিনী জল চাহিতেছে। আমি আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর গিয়া পালঙ্গের ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম। প্রমোদিনী আমার দিকে কটাক্ষে একবার দেখিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল। সেই কটাক্ষে তাহার মনের ভাব বুঝিলাম, চক্ষুর জল আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অলক্ষিত ভাবে প্রদীপের অল্প আলোকে দুই চারি ফোঁটা জল আমার চক্ষু হইতে পড়িল কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইলাম বোধ হয় কেহ দেখিতে পায় নাই। প্রমোদিনী, তুমিও সামলাইয়া লইয়াছিলে, আমাকে দেখিবা মাত্র তুমি

চক্ষু ফিরাইয়া লইলে, পরক্ষণেই বলিলে 'একটু জল দাও, ভাল করিয়া বাতাস কর'। তুমি অতি বুদ্ধিমতী ও লজ্জাশীলা ছিলে। এত লোকের মধ্যে তুমি চক্ষুর জল ফেলিলে না। কিন্তু তোমার সেই কাতর ভাব পরিপূর্ণ কটাক্ষ দ্বারা তোমার মনের ভিতর যে কি ঝড় বহিতেছিল তাহা বুঝিতে আমার আর বাকী রহিল না।

আমি আসিয়াই ম্যাকোনেল সাহেব ডাক্তার জন্য লোক পাঠাই, কিন্তু তিনি ঐ দিনের সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিতে পারিবেন না প্রকাশ করেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আসিয়া অপরাপর ডাক্তার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার সাহেবের প্রমুখাৎ পীড়া অতি কঠিন শুনিয়া আমি একেবারে হতাশ হইলাম। প্রমোদিনী এই সময় পূর্ণ-গর্ভা। ডাক্তার সাহেব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যদি এই জ্বরে প্রসব বেদনা উপস্থিত হয় তাহা হইলে ভয়ের অত্যন্ত আশঙ্কা। ডাক্তার সাহেব দেখিয়া যাইবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। নীচে দুই দিবস ধরিয়া প্রায় সর্ব্বদাই ডাক্তার উপস্থিত থাকিত। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলেই ধাত্রী আসিল। ধাত্রী ও ডাক্তারগণের সাহায্যে এক ঘণ্টার মধ্যে প্রমোদিনী সুন্দর একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। যেরূপ কষ্ট হইবার আশঙ্কা ডাক্তারেরা করিয়াছিল তদ্রূপ কোন কষ্টই হয় নাই। প্রসবের পরে প্রমোদিনী নিজেও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ মনে করিয়াছিল। আমিও ভাবিয়াছিলাম সকল বিপদ দূর হইল। পরদিন শনিবারের প্রাতঃকালে প্রমোদিনীকে আরও সুস্থ

দেখিয়া আমার দুর্ভাবনা অনেক অংশে কমিয়াছিল। ডাক্তার সাহেবও প্রাতঃকালে আসিয়া বলিলেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ ও বিপদের আশঙ্কাও অনেক কম। পূর্ব্বে ডাক্তারেরা যে বলিয়াছিল, বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই তাহা প্রমোদিনী কি প্রকারে জানিতে পারিয়াছিল ও সেই শনিবারের প্রাতঃকালে সেই সম্বন্ধে আমার সহিত ডাক্তারদের মত লইয়া কত পরিহাস করিতে লাগিল। কিন্তু হায়। সেই দিন বৈকালে তাহার ব্যায়রাম হঠাৎ আবার বাড়িয়া পড়িল, তাহা আর কমিল না। বেলা ২॥টার সময় প্রমোদিনীর হঠাৎ মূর্চ্ছার মতন হইল। প্রায় ২৩ ঘন্টা বাক্ রহিত ও জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার জ্ঞান হইল। সেই অবধি আমাকে তাহার নিকট হইতে কোথাও অল্পক্ষণের জন্যও যাইতে দিত না।

প্রমোদিনী, সেই শনিবারের রাত্রির কথোপকথন আমি কখন ভুলিব না। তাহা ভুলিবার নহে। মনের মধ্যে চিরকালের জন্য তাহা খোদিত রহিয়াছে, শরীরের গ্রন্থে গ্রন্থে গাঁথা রহিয়াছে, চক্ষের সম্মুখে যেন স্বর্ণাক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। আমার হাত ধরিয়া সেই দিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছিলে "আমি মরি কোন দুঃখ নাই, আমি বেশ যাইব, আমার মতন কয় জন যাইতে পারে, কিন্তু ছেলেদের জন্য আমার ভাবনা হইতেছে"। রাত্রিতে তোমার বিছানার উপরে তোমার নিকট বসিয়া গালে হাত দিয়া তোমার মুখপানে চাহিয়া আমি যখন ভাবিতেছিলাম তখন তুমি আমার গণ্ডদেশ হইতে হাত সরাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলে

"তুমি কেন আমার জন্য এত ভাবিতেছ"। আমার চক্ষের জল মোছাইয়া তুমি বলিয়াছিলে "আমার জন্য ভাবিও না, আমি বেশ যাইতেছি"। যদি তুমি কখন আমার জন্য কষ্ট পাইয়া থাক বলিয়া তোমার নিকট আমি যখন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তখন তুমি বলিয়াছিলে 'তুমি কি করিয়াছ, কেন একপ বলিতেছ? তুমি আমাকে যেরূপ সুখে রাখিয়াছিলে অল্প স্বামিই তাহা করে। আমার অদৃষ্টে নাই ভোগ করা'। "আমাকে শেষ চুম দাও বলিয়া" তুমি আমাকে যখন শেষ চুম্বন করিলে তখন চক্ষের জলে তোমার গণ্ডদেশ যে ভাসিয়া গিয়াছিল। সেই দৃশ্য আমার মনে সর্ব্বদা জাগরিত আছে। কাতর ও গম্ভীর স্বরে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে "তুমি কি আবার বিবাহ করিবে"? আমি বলিলাম 'না'। তুমি উত্তর করিলে "অমন অনেকে বলিয়া থাকে"। দুই মাস কি চারি মাস জোর দুই বৎসর তাহার পরে আবার বিবাহ করে। বিবাহ করিও না, কি হইবে? "দেখো ছেলেদের যেন পর করিও না"। ছেলেরা পড়া বলিতে না পারিলে আমি তাহাদিগকে মারিতাম বলিয়া তুমি তাহাও সেই সময় ভুলো নাই। আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলে "তুমি হঠাৎ রাগিয়া যাও, তুমি নিজে ছেলেদের লেখা পড়া দেখিও না"। যখন আমি অল্পক্ষণের জন্য ঘরের বাহিরে আসিবার নিমিত্ত তোমার সেই পালঙ্গ হইতে উঠিয়া দাঁড়াই তখন তুমি আমার কাপড় ধরিয়া বলিতে লাগিলে "আমার নিকট হইতে তুমি এখন যাইতে পারিবে না" কিন্তু বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় আমি

যাইতে উদ্যত হইলে তুমি তোমার করদ্বয় কপালে তুলিয়া বিদায়-সূচক স্বরে বলিয়াছিলে "তবে নমস্কার"। প্রমোদিনী, এ হতভাগ্য তোমার নমস্কারের উপযুক্ত পাত্র নহে। তুমি সতী ও সাবিত্রী ছিলে। তুমি সর্ব্বগুণে ভূষিতা ছিলে। তোমার নিন্দা কখন কাহাকে করিতে শুনি নাই। আমি তোমার অনুপযুক্ত স্বামী বলিয়াই ঈশ্বর তোমাকে কাড়িয়া লইলেন।

এই সকল কথোপকথনের মধ্যে প্রমোদিনীর হঠাৎ একবার খেয়াল হইয়াছিল। হঠাৎ একবার ভীত স্বরে বলিয়া উঠিয়াছিল 'ঐ ঐ এলো, ঐ যে এলো'। আমি তখনি বুঝিয়াছিলাম আর আশা নাই। কিন্তু তখনই আবার সামলাইয়া সে পূর্ব্ব মতন কথোপকথন করিতে লাগিল। প্রমোদিনী, তুমি বলিয়াছিলে "দেখো যেন আমি রামকৃষ্ণের আগুন পাই"। সেই রাত্রিতে তুমি প্রার্থনা করিয়াছিলে "ঈশ্বর, রাত্রিতে যেন আমার মৃত্যু না হয়, কাল দিনের বেলায় আমি যেন মরি"। সতীর প্রার্থনা ঈশ্বর কখন অবহেলা করেন না। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা অনুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম "ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর, তুমি যে কালী-ঠাকুর সর্ব্বদা পূজা করিতে তাঁহাকে স্মরণ কর"। তুমি উত্তর করিয়াছিলে "আমি কি তাহা করিতেছি না"। ইহার পরক্ষণেই তোমার অর্দ্ধস্ফুট স্বরে প্রার্থনা "ঠাকুর, সকলেই নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য শিশু, রক্ষা কর" এখনও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এইরূপ কথোপকথন সেই রাত্রিতে প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত

হইয়াছিল পরে ডাক্তার আসিয়া নিদ্রার নিমিত্ত "মার্ফিয়া ইনজেকসন" করিয়া দেন তাহাতে ঔষধের গুণে প্রমোদিনীর একটু নিদ্রাবস্থা হওয়ায় আমি তাহার শয্যা ছাড়িয়া অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে আসি। সেই রাত্রি আমি তাহার শয্যার পার্শ্বেই কাটাই। পরদিন রবিবারের প্রাতঃকালে প্রমোদিনীর ব্যায়রাম আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় ৯টা পর্য্যন্ত তাহার কোন জ্ঞানের বিকৃতি হয় নাই। ঐ দিন সকাল বেলায় আমি আশাতরু ও মায়াতরুকে ডাকিয়া প্রমোদিনীর হাত পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে বলি। তাহার সেই সময় জ্ঞান আছে কি না জানিবার জন্য মায়াতরুকে দেখাইয়া বলিলাম 'এ কে'? তাহাতে প্রমোদিনী একটু হাসিয়া মায়াতরুর চিবুক ধরিয়া বলিল "কেন, ভোলা। ছেলেদের কেন এখানে রাখিয়াছ, এদের এ ঘর হইতে লইয়া যাও"। ইহার অল্পক্ষণ পরে প্রমোদিনীর একটু নিদ্রার মতন হওয়ায় যখন আমার দিক হইতে অপর দিকে মুখ ফিরিয়া লইবার চেষ্টা করে, তখন আমি তাহার মুখ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি আর কিছু আমাকে বলিবে"? প্রমোদিনী, তখন তুমি কিছু বিরক্ত ভাবে "কি আর বলিব" বলিয়া মুখ ফিরিয়া লইলে। "কি আর বলিব" ইহা তোমার শেষ কথা। বাস্তবিক আর কিছু বোধ হয় বলিবার ছিল না। যাহা বলিবার ছিল তাহা সমুদয় মন খুলিয়া পূর্ব্ব রাত্রেই সকল বলিয়াছিলে। ঐ কথা বলিবার পরেই প্রমোদিনীর মোহ আসিল, বাকৃশক্তি রহিত হইল, অর্দ্ধ মুদ্রিত নেত্রে অজ্ঞান অবস্থায় রহিল। এই অবস্থায় ডাক্তার সাহেব

আবার আসিলেন। তিনি বলিলেন, "কি কারণে মৃত্যু হইতেছে, তাহা এখনও আমি ঠিক করিতে পারি নাই"। তত্রাচ তিনি তখনও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু ঔষধ আসিবার পূর্ব্বেই বেলা ১১॥ টার সময় প্রমোদিনী সংসারের মায়া-রজ্জু ছিন্ন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিল।

মৃত্যুর অল্পক্ষণ বাদে প্রমোদিনীর মাতা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া দেখেন, প্রমোদিনীর জীবন ফুরাইয়াছে, আত্মীয় স্বজনকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কেবল মৃত দেহ পালোঙ্গোপরি পড়িয়া রহিয়াছে।

বেলা আন্দাজ ১টার সময় পুত্র কন্যার "মা, মা" চীৎকারের মধ্যে ও আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দনের মধ্যে প্রবোধ, জ্যোতীষ ও ভৃত্যগণ প্রমোদিনীর মৃত দেহ লইয়া শেষ কার্য্যের জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইল। দাদা ও রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রমোদিনীর ইহ-জীবনের খেলা ফুরাইল, আমারও জীবনের শান্তি-প্রদীপ নিবিল। হৃদয় মরুভূমি হইল। প্রমোদিনীর চিতার আগুনের সহিত আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইহা আর ইহ-জীবনে নিবিবে না।

প্রিয়তম রামকৃষ্ণ! তুমি ধন্য। তুমি এই শিশু অবস্থায় যথার্থ পুত্রের কার্য্য করিলে। পাছে আমি তুমি শিশু বলিয়া তোমাকে তোমার মাতার শেষ কার্য্যের সময় না পাঠাই সেই জন্য সে পূর্ব্ব রাত্রিতে তুমি তাহার মুখাগ্নি করিবে বলিয়া আমাকে অঙ্গিকারে বদ্ধ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু, আশাতক

মুখাগ্নির সময় না জানি তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, না জানি তুমি কত চীৎকার করিয়া রোদন করিয়াছিলে। জন্মের মতন চিতার উপরে তুমি তোমার মাতার মূর্ত্তি দেখিয়া লইলে। সেই মূর্ত্তি বোধ করি তোমার জীবনে কখন ভুলিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যে মুখে তোমাকে 'বাবা' ভিন্ন বলিয়া ডাকে নাই, মিষ্ট-সম্ভাষণ বিনা কটূক্তি কখন করে নাই, যে মুখে তোমাকে শত সহস্র বার স্নেহ-চুম্বন করিয়াছিল, কোন পাষাণ হৃদয়ে সেই মুখে অগ্নি প্রদান করিলে? তুমি অতি নিষ্ঠুর। যে জননী তোমাদের সুখ-শান্তির জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত, যে জননী মৃত্যু-শয্যায় পতিত হইয়াও তোমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিল, যে জননী তাহার জীবনের শেষ মুহুর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমাদের মঙ্গল-কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, কোন প্রাণে তুমি তোমার সেই স্নেহময়ী জননীকে শশ্মানে ছাই-ভষ্ম করিয়া চলিয়া আসিলে? যে হীরক পোড়াইয়া তুমি অঙ্গার করিলে, তাহা আর মিলিবে না। না, আমার ভুল। তোমার হৃদয় পাষাণ নহে। তুমি যথার্থ 'পুত্র' নামের উপযুক্ত। যে সকল কারণ জন্য লোকে পুত্র অভিলাষ করিয়া থাকে, তুমি এই শিশু অবস্থায়ই সেই সকল কার্য্য সমাধা করিলে। তুমিই ঈশ্বরের কৃপার উপযুক্ত পাত্র। তুমি দীর্ঘজীবি হও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। যে পরিমাণে তুমি মনস্তাপ পাইয়াছ, সেই পরিমাণে ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন।

শ্রীমান্ জ্যোতীষ চন্দ্র। তুমিও তোমার কর্ত্তব্য সাধনে

ক্রুটী কর নাই। তোমার শরীর অসুস্থ থাকা স্বত্ত্বেও তুমি তোমার কাকী-মার শবদেহ বহিয়া লইয়া যাইতে কাহার নিষেধ শুনিলে না। ঈশ্বর তোমার শরীর চির-সুস্থ রাখুন। তুমি তোমার কাকী-মাকে মাতাসম দেখিতে ও মাতাসম ভাল বাসিতে। তোমার কাকীমাও তোমাদিগকে নিজের সন্তানসম ভাবিত। তুমি যথার্থই স্বজনের কার্য্য করিয়াছ। ব্যায়রামের সময় হইতে শশ্মানে দাহ পর্যন্ত তোমরা যেরূপ পরিশ্রম, সেবা ও শুশ্রুষা করিয়াছিলে, তাহা আমি কখন আমার জীবনে ভুলিব না।

প্রিয় প্রবোধ! ভাই, তুমি যথার্থই দেবরের কার্য্য করি-য়াছ। তোমার মন অতি উদার। লোকের কষ্ট দেখিলে তোমার মন দয়ায় পরিপূর্ণ হয়। প্রমোদিনীর ব্যারাম-জনিত কষ্ট লাঘব জন্য তুমি কিনা করিয়াছ। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া কত ঔষধ সেবন করাইয়াছ। কতবার কত ডাক্তার দিন রাত্রি ডাকিয়াছ। মাথার যন্ত্রণা নিবারণের জন্য ২।৪ ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমান্বয়ে বরফের ব্যাগ ধরিয়া কত কষ্ট ভোগ করিয়াছ। শেষে শশ্মান পর্য্যন্ত গিয়া তাহার ইহজগতের সমুদয় যাতনা দূর করিলে। আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াও তোমার এ ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিব না।

দাদা। আপনাকে আর কি বলিব। এ হতভাগ্য আপ-নার সম্বন্ধে বলিয়া শেষ করিতে পারে না। যিনি জ্যেষ্ঠ সহোদর, যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, যাঁহার যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছি, যাঁহার ব্যয়ে শিক্ষিত হইয়াছি, সেই দেবতুল্য

গুরুজন সম্বন্ধে কিছু লেখা এ ক্ষুদ্র লেখনীর সাধ্যাতীত। আপনি আমাকে সংসারী করিয়াছেন। আপনিই আমাকে এই রত্ন সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু আমি তাহা রাখিতে পারিলাম না, হেলায় হারাইলাম। প্রমোদিনী আপনাকে দেবতার মতন শ্রদ্ধা করিত। কোন কারণে আমি কখন আপনার উপর বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলে সে তখনই রাগ করিত, আপনার স্নেহ ও যত্নের কথা তখনই স্মরণ করাইয়া দিত। সে সর্ব্বদাই বলিত "তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় টাকা দিয়া প্রত্যুপকার করা সহজ নহে কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও যেন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ত্রুটী না হয়"। কিন্তু দাদা, আপনি আমার একটী ক্ষোভ চিরকালের জন্য রাখিয়া দিলেন। প্রমোদিনীর মৃত দেহের সহিত আপনি আমাকে শশ্মানে যাইতে দিলেন না। তাহার দেহ ভস্মীভূত হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নিকট আমি থাকিতে পারিলাম না। তাহার সুখের সঙ্গী ছিলাম, কিন্তু কষ্টের সাথি হইতে পারিলাম না।

প্রমোদিনী, সকলই ফুরাইল। যশোহরে থাকিতে এক দিন আমার সহিত কথোপকথনের সময় তুমি অগ্রে মরিবে যেমন দর্পের সহিত বলিয়াছিলে কার্য্যেও তাহা করিলে। আমার সোণার সংসার তোমা বিনা ছারখার হইল। সেই গৃহশ্রী আর নাই। আশাতরুর, মায়াতরুর সেই প্রফুল্লতা আর নাই। বনলতার, হেমলতার সেই বেশ-ভূষার পারিপাট্য আর নাই। অজ্ঞান জ্ঞানতরুরও সেই আবদার আর নাই। তোমার নব-প্রসূত শিশুটীও আর নাই। তুমি অকূল বিপদ

সাগরে আমাকে ফেলিয়া পলাইয়াছ। এই কি তোমার উচিৎ হইয়াছে? অধিক দিনের জন্য যে কখন পরস্পর কাছ ছাড়া হই নাই। মৃত্যু শয্যায়ও খেয়ালের মধ্যে যে তুমি বলিয়াছিলে "দুইটা চাবি, তোমার দাদাকে ফেলিয়া দাও, চল দুই জনে আমরা সন্ন্যাসী হইয়া যাই"। তুমি ত যথার্থই সন্ন্যাসিনী হইয়া গিয়াছ। সংসারের মায়া তুমি একেবারে ছিন্ন করিয়াছ। এক কপর্দ্দকও পর্য্যন্ত তুমি সঙ্গে করিয়া লইলে না। পুত্র, কন্যা, স্বামী, আত্মীয় স্বজন কাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিলে না। নিজের দেহ পর্য্যন্ত অনায়াসে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছ। যে দেহে আতর গোলাপ মাখাইতে সেই দেহকে পোড়াইয়া ছাই ভস্ম করিতে কিছু মাত্র মায়া হইল না। কিন্তু কৈ তুমি ত তোমার কথার মতন কার্য্য করিলে না? আমাকে ত সন্ন্যাসী করিয়া তোমার সঙ্গী করিলে না? বুঝিলাম স্ত্রী-জাতীকে বিশ্বাস করিতে নাই, স্ত্রী-জাতীর প্রেমে মজিতে নাই। তাহাদের প্রণয় বালির বাঁধ, তাহাদের ভালবাসা ছলনা মাত্র। পুরুষ অতি নির্ব্বোধ। আমি এখন পর্য্যন্ত তোমার সেই শেষ চুল-বাঁধার সরঞ্জম, তোমার সেই শেষ ঔষধের শিশি, তোমার জ্বরের শেষ পরিমাণ ১০৩° ডিগ্রি সহ তাপমান যন্ত্র, তোমার সেই আধ-বোনা পশমের ময়ুর, আধ-বোনা পশমের জুতা, সেই পশম বোনার কাটী, ছুঁচ, সকল সামগ্রী, তোমার হস্তলিপি সকল, তোমার সেই ভাঙ্গা কালীর ছবি কত যত্নে রাখিয়াছি এবং যতদিন এ দেহ থাকিবে ততদিন এইরূপ যত্ন করিয়া রাখিব, মধ্যে মধ্যে দেখিব ও

চক্ষের জল ফেলিয়া মনের ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিব। তোমার ফটো ঘরে ঘরে রাখিয়াছি, তোমার চেহারা "লকেট" করিয়া বক্ষঃ মধ্যে সর্ব্বদা ধারণ করি। তোমাকে আমি কখন ভুলিতে পারিব না। কিন্তু তোমার সেই স্নেহ, যত্ন কোথায় গেল? না, আমি তোমার আর সেই স্নেহ পাইবার আশা করিতে পারি না। আমি তোমার আর সেই যত্নের উপযুক্ত নহি। তোমার মৃত্যু শয্যায় আমি যে বিবাহ করিব না অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তাহা ভঙ্গ করিয়াছি। আমি মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি। আমি তোমার অস্পৃশ্য হইয়াছি। তোমার ঘৃণার পাত্র হইয়াছি। তোমার চিতার আগুন নিবিতে না নিবিতে, চক্ষের জল শুষ্ক হইতে না হইতে, বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে আমি আবার বিবাহ করিয়াছি। তুমি কি এই অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণ জানিতে চাহ? কারণ শুনিয়া কি আমাকে বিশ্বাস করিবে? আমাকে কি ক্ষমা করিবে?

তোমার মৃত্যুর পরে আমি যে গৃহে প্রবেশ করিতে পারিতাম না। আশাতরুর, মায়াতরুর মুখের দিকে চাহিতে পারিতাম না। তাহারা স্কুল হইতে আসিয়া 'মা, খাবার' বলিয়া আর যে বলিত না। স্কুলের বেশ ছাড়িয়া বাটীর ভিতর আর থাকিত না। দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া চক্ষের জল ফেলিত। বনলতার, হেমলতার মাথার চুল যে কটা হইয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে নিজে নিজে চুল পরিষ্কার করিতে দেখিয়া আমি যে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিতাম না। আমি আফিসে গেলে তাহারা যে খালি-গৃহে থাকিত। 'খাও'

বলিয়া তাহাদের আহ্বান করিবার যে কোন লোক ছিল না। ব্যায়রাম হইলে তাহাদের নিকট বসিয়া থাকিবার কোন লোক পাই নাই। গৃহে সর্ব্বদাই বিশৃঙ্খলতা ঘটিত। নিজের মনও সর্ব্বদা হু হু করিত। সর্ব্বদা একাকী থাকিতে ভাল লাগিত। সর্ব্বদা মনে হইত যেন পাগল হইব। কাজ কর্ম্ম কিছুই ভাল লাগিত না। নিজের অনিষ্ট জন্য আমি ভাবিতাম না। কিন্তু আমার অনিষ্ট হইলে ছেলেদের যে অনিষ্ট ঘটিবে এই চিন্তাই আমার মনে বেশী বলবৎ হইয়া উঠিল। এই সকল কারণেই দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিলাম। নিজের সুখের জন্য বিবাহ করি নাই। কারণ আমার পক্ষে সুখ দুঃখ উভয়ই এখন সমান হইয়াছে। সুখে আর স্পৃহা নাই, দুঃখে আর কষ্ট নাই। কিন্তু ছেলেদের জন্য সংসারের ঠাট বজায় রাখিতে হইবে। তাহারা এই অল্প বয়সেই 'মা' বলা ভুলিয়া যাইবে এই কথা মনে হইলেই মন যে কাঁদিয়া উঠিত। এ বয়সে স্নেহ যত্ন না পাইলে যে তাহারা শুকাইয়া যাইবে ?

অনুপমে, এখন তোমারই উপর সকল বিষয় নির্ভর করিতেছে। তোমার নিজের, ছেলেদের ও আমার সুখ দুঃখ সকলই এখন তোমার হাতে। তোমার প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে আমি কিছু মাত্র ত্রুটী করিব না। কিন্তু এক ভিক্ষা তোমার নিকট—দেখ, ছেলেরা যেন তোমাকে বিমাতা বলিয়া না জানে—"ছেলেরা যেন পর না হয়"—আমি যেন তাহাদের কোন অনিষ্টের কারণ না হই। তুমি ইচ্ছা করিলে আমার

ভগ্ন গৃহ আবার নূতন করিতে পার, আমার মরুভূমি-প্রায় হৃদয় আবার সরস করিতে পার।

আমি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিলাম না। অতীতের বিষয় ভাবিলাম না। ভবিষ্যতের চিন্তা করিলাম না। বর্ত্তমান অবস্থানুসারেই কার্য্য করিলাম। ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে। ঈশ্বর যেরূপ আদেশ করিবেন তাহাই করিব।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" ॥

কয়েক খানি পত্র।

শ্রীশ্রীকালি

সহায।

কলিকাতা,

২বা মার্চ্চ, বুধবাব, ১৮৯২ সাল।

প্রিয সাতকডি,

গত কল্য তোমাব পত্র পাইযা সকল সমাচাব অবগত হইলাম। তোমাব শরীব অসুস্থ আছে শুনিযা বড ভাবিত বহিলাম। তুমি কেমন আছ তাহা পত্র পাঠ মাত্র লিখিবে। তুমি খুব সাবধানে থাকিবে। ওখানে আব এখন কোন ব্যাযবাম হইতেছে কি না লিখিবে। ছেলেবা ভাল আছে। আব সকলে ভাল আছে। আমাদেব জন্য তুমি বেশী ভাবিবে না। আমাব মন এখনও এখানে বসে নাই। সর্ব্বদাই আমাব মন কেমন কেমন কবে। তুমি প্রত্যহ পত্র দিবে। কোন মতে অন্যথা কবিও না। ইতি।

তোমাবই,

প্রমোদিনী।

শ্রীশ্রীকালি

সহায়।

শোভাবাজার,

৩রা মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, ১৮৯২ সাল।

প্রিয় সাতকড়ি,

কল্য তোমার পত্র পাইয়াছি। ওখানে এখনও ওলাউঠা হইতেছে শুনিয়া বড় ভয় হইল। তুমি খুব সাবধানে থাকিবে। তোমার খাওয়া দাওয়া কিরূপ হইতেছে তাহা লিখিবে। তুমি কাছারিতে জল খাও কিনা ও বাড়িতেই বা কি জল খাও তাহা লিখিবে। তুমি খাওয়া দাওয়া খুব সাবধানে করিবে। তুমি কেমন আছ তাহা প্রত্যহ লিখিবে। ছেলেরা ও আমি ভাল আছি। এখানে আর সকলে ভাল আছে। তুমি বেশী রাত অবধি বেড়াইবে না। আমার এখানে কিছু মাত্র ভাল লাগিতেছে না। পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবে। ইতি।

তোমারই,

প্রমোদিনী।

শ্রীশ্রীকালি

সহায়।

কলিকাতা,

১০ই মার্চ্চ, ১৮৯২ সাল।

প্রিয় সাতকড়ি,

তোমার পত্র পাইয়াছি। ছেলেরা ভাল আছে। তুমি কেমন আছ তাহা লিখিবে। তুমি খুব সাবধানে থাকিবে।

প্রত্যহ পত্র দিবে। তুমি যে টাকা পাঠাইযাছ তাহা পাইযাছি। তুমি বাদবাকী টাকা কিরূপ খরচ করিলে তাহা আমায লিখিবে। তুমি যে সকল জিনিস পাঠাইতে লিখিযাছ তাহা গেণী পাঠাইযা দিবে। * * * ভোলা তোমায চিঠি লিখিল। আমার চিঠির ভিতর ভোলার চিঠি দিলাম। পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবে। ইতি।

তোমারই,

প্রমোদিনী।

কলিকাতা,

১১ই মার্চ্চ, সোমবার, ১৮৯২ সাল।

প্রিয সাতকড়ি,

তোমার পত্র আজ দুই দিবস হইল পাই নাই। তোমার পত্র না পাইযা আমার মন অত্যন্ত খারাপ আছে। তুমি কেন পত্র দিতে দেরি কর? তুমি কেমন আছ তাহা পত্র পাঠ মাত্র লিখিবে। মাযা বড তোমার জন্য কাঁদে। তাহাকে এখানে রাখা দায। সে সর্ব্বদা কাঁদে ও বড দুষ্টামি করে। মাযা বলে আমাকে মা তুমি আমার বাবুর কাছে পাঠাইযা দাও। বাবুর জন্য আমার মন কেমন করে। রামকৃষ্ণের, মাযার লেখা পড়া ভাল হয না। * * * * তুমি প্রত্যহ পত্র দিবে। কোন মতে অন্যথা করিও না। ইতি।

তোমারই,

প্রমোদিনী।

১৭ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, ১৮৯২ সাল।

প্রিয় সাতকড়ি,

তোমাব পত্র কাল পাই নাই। তোমার চাকবির গেজেট হইয়াছে। বোধ হয আজ তুমি জানিতে পাবিযাছ। রামকৃষ্ণ, মায়াব লেখা পড়া কিছুই হইতেছে না, যাহা শিখিয়াছিল তাহাও সব ভুলিযা গিযাছে। ছেলেদের লেখা পড়া এখন থেকে না দেখিলে আব কবে শিখিবে। আমি এই জন্য বামকৃষ্ণ, মাযাকে তোমাব নিকট বাখিযা আসিতে চাহিযা ছিলাম। বামকৃষ্ণব ৭ বৎসব বযস হইতে চলিল এখন ফাষ্ট-বুক শেষ কবিতে পাবিল না। তবে কিরূপ করে লেখা পড়া হইবে। আব মাযা বড দুষ্টামি কবে। মাষ্টাব সমস্ত দিনেব মধ্যে একবাব দুই ঘণ্টা পড়াইয়া যায় তাব পব সমস্ত দিন দুষ্টামি কবে। তুমি কেমন আছ তাহা লিখিবে। তুমি যেন এব মধ্যে ছুটী লইবাব জন্য তাড়াতাড়ি কবিও না। ছেলেবা ভাল আছে। তুমি খুব সাবধানে থাকিবে। পত্রের উত্তব শীঘ্র দিবে। ইতি।

তোমাবই,

প্রমোদিনী।

৮ই সেপ্টেম্বব, ১৮৯৩ সাল।

প্রিয সাতকড়ি,

তোমাব টেলিগ্রাম অদ্য বেলা দশটাব সময পাইযাছি। তুমি, বামকৃষ্ণ, ভোলা কেমন আছ পত্র পাঠ মাত্র লিখিবে।

বামকৃষ্ণ, ভোলা আমাদেব জন্য কিছু কবে কিনা লিখিবে। তাহাদেব জন্য মাষ্টাব শীঘ্র বাখিবে। তাহাদেব তুমি মারিও না। তাহাদেব আমাকে পত্র লিখিতে বলিবে। বামকৃষ্ণব ও ভোলাব খাওযা দাওযা তুমি নিজে দেখিবে। তোমাদেব কাঁথি পৌঁছিতে এত দেবি হইল কেন? পথে কোন কষ্ট হইযাছিল কিনা লিখিবে। তুমি প্রত্যহ পত্র লিখিবে।

তোমাবই,

প্রমোদিনী।

প্রিয আশাতরু হালদার,

কল্যান ববেষু।—

বাবা, গতকল্য তোমাব এক পত্র পাইযা বড আহ্লাদিত হইলাম। তোমবা ভাল আছ শুনিযা বড় সুখী হইলাম। তোমাব খোস ভাল হইযাছে কিনা লিখিবে। যদি না ভাল হইযা থাকে তাহা হইলে প্রত্যহ গবম জলে ও সাবান দিযা ধুইবে। বাবুব নিকট হইতে ঔষধ লইবে। তোমাতে ও ভোলাতে মাবামাবি কবিও না। দুপুব বেলায বাবু বাছাবি যাইলে পব তোমবা দুই ভাইযে গোলমাল কবিও না। বাবুব কথা শুনিবে। তোমবা মন দিযা লেখা পডা কবিবে। তুমি কেমন আছ তাহা লিখিবে। আমাব আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি।

অশীর্ব্বাদিকা মাতা।

১১ই সেপ্টেম্বব, ১৮৯৩ সাল।

১৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৮৯৩ সাল।

প্রিয় সাতকড়ি,

অদ্য তোমার পত্র ও টাকা পাইয়াছি রামকৃষ্ণ, ভোলা তুমি কেমন আছ তাহা লিখিবে। তাহাদের মাষ্টার কি নিয়মে রাখিয়াছ? শুধু সকাল ও বৈকাল বেলায় পড়াইয়া যায় না দুপুর বেলায় থাকে, তাহা লিখিবে। রামকৃষ্ণ ভোলা আমার জন্য কিছু করে কিনা। রামকৃষ্ণের খোস উত্তমরূপে ভাল হইযাছে কি লিখিবে। ভোলার যে মধ্যে মধ্যে পেটের অসুখ করিত তাহা এখন ভাল হইযাছে কি লিখিবে। তাহারা দুই ভাইযে মারামারি করে কি লিখিবে। তুমি সন্ধ্যার সময বেড়াইতে যাইও না। তুমি ছেলেদের কখন মারিও না কি বকিও না। ছেলেদের জন্য আমার মন অত্যন্ত খারাপ থাকে। তুমি ছেলেদের খুব সাবধানে রাখিবে।

মার পত্র পাইযাছি। ছেলেদের তোমার সঙ্গে পাঠাযাছি বলিযা মা কিছু দুঃখ করিযাছেন। রামকৃষ্ণ, ভোলাকে মাকে পত্র লিখিতে বলিবে।

তুমি নিজে খুব সাবধানে থাকিবে। দেখিও যেন কোন বদনাম না হয। * * * *

তোমার,

প্রমোদিনী।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সাল।

প্রিয় সাতকড়ি,

আজ কযেক দিবস তোমার কোন পত্র না পাইয়া বড়

ভাবিত আছি। পত্র পাঠ মাত্র তুমি, রামকৃষ্ণ, ভোলা কেমন আছে তাহা লিখিবে। রামকৃষ্ণের খোস ভাল হইয়াছে কি লিখিবে। তুমি পত্র না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক কি করিয়া? তুমি জান না যে আমার প্রাণ তোমাদের কাছে পড়িয়া আছে? রামকৃষ্ণ, ভোলা কিছু মোটা সোটা হইয়াছে কি লিখিবে। তাহাদিগকে আমায় পত্র লিখিতে বলিবে।

তোমার,

প্রমোদিনী।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সাল।

মায়াতরু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পেটের অসুখ ভাল হইয়াছে শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি তোমার দাদার সঙ্গে মারামারি করিও না। মন দিয়া লেখাপড়া করিবে। বাবুর কথা শুনিবে। আমায় পত্র দিবে। বনলতা, হেমলতা, খোকাবাবু ভাল আছে। তুমি কেমন আছ লিখিবে। ইতি।

তোমার,

মাতা।

২১শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, ১৮৯৩ সাল।

প্রিয় সাতকড়ি,

আজ তোমার এক পত্র পাইয়া জানিলাম যে রামকৃষ্ণের জ্বর হইয়াছে, ইহা শুনিয়া বড় ভাবিত রহিলাম। রামকৃষ্ণের

জ্বর খোসের জন্য হইয়াছে না ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে, তাহা লিখিবে। কেন জ্বর হইল? তাহারা কয়দিন অন্তর স্নান করে? বোধ হয় বেশী জলে স্নান করে। তুমি বোধ হয় ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া শোও, হিম লাগিতে পারে। রামকৃষ্ণকে তুমি নিজে কাছে করিয়া শুইবে। তোমরা কিসে শোও তাহা লিখিবে। রোগা ছেলে তাঁহাকে একলা শোয়াইবে না। তাহার কাছে যেন সর্ব্বদা একজন লোক থাকে। রামকৃষ্ণের জন্য যে আমার মন কি করিতেছে তাহা পত্রে কি লিখিব। রামকৃষ্ণকে খুব সাবধানে রাখিবে। দুপুর বেলায় তাহার কাছে কে থাকে তাহা লিখিবে। তাহার জ্বর প্রত্যহ ছাড়িয়া জ্বর আসে, না একাজ্বরি তাহা লিখিবে। তাহাকে বেশী জল খাইতে দিও না। রামকৃষ্ণের জ্বর যদি দুই এক দিনের মধ্যে ভাল না হয় তাহা হইলে আমাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবে; কারণ, আমি এরূপ অসুখ শুনিয়া থাকিতে পারি না। আমি চাতক পাখির ন্যায় রহিলাম। তুমি প্রত্যহ পত্র লিখিবে। তোমাকে রামকৃষ্ণের কথা বারম্বার লেখা বাহুল্য। তাহাকে খুব সাবধানে রাখিবে।

তোমার,

প্রমোদিনী।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ সাল।

মায়াতরু হালদার,

বাবা, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমরা ভাল আছ তাহা

জানিলাম। তোমরা মন দিয়া লেখা পড়া করিবে। তোমরা কেমন আছ লিখিবে। বনলতা, হেমলতা ভাল আছে। খোকাবাবু ভাল আছে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমরা কবে এখানে আসিবে তাহা লিখিবে। পত্রের উত্তর শীঘ্র দিবে। ইতি।

তোমার,

মা।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ সাল।

প্রিয় সাতকড়ি,

গত কল্য তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি যশোহর জেলায় বনগাঁয় বদলি হইয়াছ। ছেলেরা ভাল আছে। তোমার বড় খোকাবাবু ভাল আছে। তুমি কেমন আছ লিখিবে। সাবধানে থাকিবে। আজ তাড়াতাড়ি করিয়া পত্র লিখিলাম কারণ ডাক চলিয়া যাইবে। বদলির খবর দিবার জন্য এত তাড়াতাড়ি পত্র দিলাম।

তোমার,

প্রমোদিনী।

১৫ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, ১৮৯৫ সাল।

প্রিয় সাতকড়ি,

আজ তিন চার দিন হইল তোমার কোন পত্র পাই নাই। তুমি কেমন আছ তাহা লিখিবে। তুমি কবে ওখানে

হইতে বহনা হইবে ও কবে এখানে আসিযা পৌঁছিবে তাহা আমি কিছু জানিতে পাবিলাম না। ছেলেবা এক বকম ভাল আছে। ইতি।

তোমাব;

প্রমোদিনী।

শেষ পত্র।

প্রিয় সাতকড়ি,

আমাব এখন জ্বব নাই। কিন্তু বুকে ও পাঁজবায ভযানক বেথা আছে। ভোলাব, বনলতাব জ্বব নাই। বামকৃষ্ণব আজ জ্বব হইযাছে। তুমি কেমন আছ লিখিবে। চাকব, বামুন পাইযাছে কি লিখিবে। হেমলতাব জ্বব আছে। ইতি।

প্রমোদিনী।—

২৩শে ফেব্রুযাবী, ১৮৯৬ সাল।